১

বিশাল সাদা বাংলো টাইপের বাড়ীটার সামনে এসে থামলো ট্যাক্সিটা। নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের চীফ সার্জনের বাড়ী। রাত্রি ট্যাক্সি থেকে অনেকটা ছুটে বেড়িয়ে, এই বাড়ীটার ভেতরে ঢুকতে উদ্দ্যত হতেই মনে হলো, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া দেয়া হয়নি। ব্যাপারটা মনে হতেই রাত্রি দ্রুত ট্যাক্সির কাছে ফিরে এসে বললো, ড্রাইভার সাহেব একটু অপেক্ষা করেন, এক্ষুনিই ফিরে আসবো।

রাত্রি যেমনি ছুটে এসেছিলো, ঠিক তেমনি আবারও ছুটে বাড়ীটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

এই সংসারে আপন বলে কেউ নেই, তেমনি একটি মেয়ে হলো রাত্রি।

রাত্রি বিশেষ কোন লেখাপড়া করেনি। অথবা, অন্যভাবে বললে বলতে হবে, লেখাপড়া করার মতো কোন সুযোগ তার হয়ে উঠেনি। তার শৈশব কেটেছে এতিমখানাতে। এতিমখানার পরিবেশে যা কিছু বিদ্যা সে অর্জন করেছে, তাই নিয়েই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা ভেবেছিলো সে। যখন তার বয়স সতেরো কি আঠারো, এতিমখানার পক্ষ থেকেও চাপ দেয়া হচ্ছিলো, কোন একটা কাজে নেমে পড়ার জন্যে। এবং এতিমখানার সুপার সাহেবের কল্যানেই, তার চাকুরী হলো একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালে, নার্স হিসেবে। আর সেই হাসপাতালের নাম হলো, নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতাল।

রাত্রির আসল নাম কি, অথবা আসল নাম বলতে কোন কিছু আদৌ ছিলো কিনা, সে নিজেও জানেনা। এতিমখানার গেইটের সামনে এক রাতে, এক রকম অজ্ঞাতভাবে যখন তাকে পাওয়া গেলো, তখন থেকেই এতিমখানার সুপার সাহেব তাকে আদর করে নাম দিয়েছিলো রাত্রি। আর সেই থেকেই তার নাম রাত্রি। নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালেও সে এক নামে পরিচিত, রাত্রি।

চিটাগং এর এই নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতাল, বাংলাদেশের অন্য সব হাসপাতাল থেকে একটু আলাদা। এই হাসপাতালের চিকিৎসা এবং নার্সিং সিস্টেমগুলো, উন্নত দেশের হাসপাতালগুলোর সমমানের। এখানকার নার্সেরা সবাই স্বীকৃত নার্স ইনষ্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। নার্সিং এর উপর যার কোন প্রশিক্ষণ নেই, অথবা, বাস্তব অভিজ্ঞতাও নেই, এমন একটি মেয়ের চাকুরী এখানে হবার কথা নয়। আর তাই, এতিমখানার সুপার সাহেব যখন, তাকে নিয়ে নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের পরিচালক সাহেবের কাছে, নার্সের একটা চাকুরীর জন্যে প্রস্তাব করেছিলো, তখন হাসপাতালের পরিচালক সাহেব এক কথায় মুখের উপর নাকচ করে দিয়েছিলো। অথচ, ডানপিটে, আর কিছুটা পাগলী স্বভাবের মেয়ে, রাত্রি তাকে ছাড়লোনা। সেও পারিচালক সাহেবের মুখের উপর এমন সব কথা বলেছিলো যে, পরিচালক সাহেব বোকা বনে গেলো। তাকে চাকুরী না দিয়ে আর পারলোনা।

রাত্রির চাকুরী হয়েছিলো, সার্জারী বিভাগের একজন নার্স হিসেবে। আর এই রাত্রির দেখাশোনা আর প্রাথমিক প্রশিক্ষনের দায়ীত্বটা পরেছিলো রাধিকার উপর। এতিম এই বাচাল প্রকৃতির, পাগলী রাত্রিকে, হাসপাতালের অন্যান্য নার্সেরা যখন, এড়িয়ে

যেতো, উপহাস করতো, তখন, রাধিকা অনেকটা মমতা আর স্নেহ দিয়ে, রাত্রিকে একজন পরিপূর্ণ নার্স হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো। রাত্রিও রাধিকার মমতা পেয়ে, পৃথিবীর একমাত্র আপনজন ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না তাকে।

রাধিকার বিয়ে হয়েছে, নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের চীফ সার্জন, ডাঃ সাকীবের সাথে। একই হাসপাতালের নার্স হিসেবে, সাকীবের সাথে একটা সামাজিক ব্যাবধান থাকার কথা। অথচ, রাত্রি সাকীবকে, নিজ আপন ভগ্নীপতি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনা। আর সাকীবও রাত্রিকে স্নেহ করে আপন বোনের মতোই।

সাকীব টাই বিরম্বনায় ভুগছিলো। আজ একটি বিশেষ সমাবেশ আছে, যেখানে সারা দেশের গন্যমান্য ডাক্তার আর নার্সরা সমবেত হবে চিটাগং পাবলিক মিলনায়তনে। সেখানে তার এবং তার স্ত্রীর ও যাবার কথা। বর্তমানে, তার স্ত্রী রাধিকা হলো নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের, সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনের সুপারভাইজার। এখন ম্যাটার্নিটি ছুটিতে আছে। এই বিশেষ একটা কনফারেন্সে অংশগ্রহন করার খুবই ইচ্ছা রাধিকার। অথচ, সময়টা এমনি যে, যে কোন মুহুর্তে তার ডেলীভারী হয়ে যেতে পারে। তাই সে এখনো, রাতের ঘুমোনোর পোষাকেই খাটের কোনে দেবতার মতো হয়ে স্হির বসে একটা পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিলো। সাকীব, হাতে দুটো টাই নিয়ে আবারো বললো, এই রাধিকা, বলোনা কোন টাই টা এই স্যুটের সাথে ভালো মানাবে?

রাধিকার এমন একটা সংকটকালীন সময়ে, সাকীবের এই ছেলেমানুষী প্রশ্নে, মেজাজটা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছিলো তার। সে বললো, একটা পরলেই তো হয়, এতো চেচামেচি করছো কেনো এই সাত সকালে।

সাকীব বললো, আহা তুমি বুঝতে পারছোনা, আজকে একটা বিশেষ সমাবেশ। চীফ সার্জন হিসেবে আমাকে স্পীচও দিতে হবে। যেমন তেমন টাই পরলে তো আর চলবেনা।

ঠিক তখুনি, বলা নেই, কওয়া নেই, রাত্রি এসে ঘরের ভিতর ঢুকলো। রাত্রিকে দেখে সাকীবের চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করো উঠলো তখন। সে, রাত্রিকে উদ্দেশ্য করে বললো, রাত্রি, তুমি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছো। বলতো? কোন টাইটা আমাকে ভালো মানাবে?

রাত্রি দুটো টাই ই বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলো, তারপর বললো, দুটো টাই ই দেখতে কি বিশ্রী! এক কাজ করেন। কোনটাই পরার দরকার নেই। কার পছন্দে কিনেছেন এই টাই দুটো?

রাধিকা ক্ষেপে গেলো সংগে সংগে। বললো, কার পছন্দে আবার? আমার পছন্দে! বিশ্রী কোথায় দেখলি তুই?

রাধিকা রাগে কাঁপছে, সে তার বিশাল পেটটা নিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাত্রির দিকে এগিয়ে এসে বললো, অন্যের পছন্দের জিনিষকে এত সহজে মন্দ বলিস কি করে তুই? তোকে আমি এমন এক থাপর দেবো যে, জীবনে মনে থাকবে।

রাত্রি বিড় বিড় করে বললো, কি বলতে কি বলে ফেললাম। এতো দেখছি, এক মহা মুসিবতে পরলাম। সে সাথে সাথে কথা ঘুরিয়ে বললো, না না না ডাঃ সাকীব, দুটোই চমৎকার, আপনি বরং এক কাজ করেন, দুটোই পরে ফেলেন।

তারপর, রাধিকাকে উদ্দেশ্য করে বললো, রাধিকা সিষ্টার, তুমি এখনো এই কাপরে? এই কাপরে যাবে নাকি কনফারেন্সে? আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি! তাড়াতাড়ি রেডী হয়ে নাও তো। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!

রাধিকার মেজাজটা আরো খারাপ হচ্ছে। এই মেয়েটিকে সে খুব স্নেহ করে। সাধাসিধে সরল প্রকৃতির এই মেয়েটি, নিজের অজান্তেই মন জয় করে ফেলেছে তার। এই কয় বছরে রাধিকার প্রমোশন হয়ে নার্স সুপারভাইজার হয়েছে, অথচ রাত্রির প্রতি আলাদা একটা মমতা সবসময়, যা একই নার্স ষ্টেশনের অন্য নার্সদের প্রতি নেই। তার সব রাগ যেনো সকীবের উপর গিয়ে পরলো। সে সাকীবকে ঠেলে সরিয়ে আবারো বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো।

সাকীব রাত্রির কথায় বেশ হতাশ এবং বিব্রতবোধ করছিলো। রাত্রি মেয়েটার এতো বয়স হলো, তারপরও তার খামখেয়ালী কমেনি। সে আবারো রাধিকাকে বললো, বলোনা রাধিকা, কোন টাই টা পরবো?

রাধিকার মেজাজটা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে, সে বললো, একটা হলেই তো হলো, কি এমন কনফারেন্স?

রাত্রি, সাকীবকে উদ্দেশ্য করে ফিশফিশ করে বললো, রাধিকা সিষ্টারের কি মন খারাপ? যাবেনা নাকি?

সাকীব বললো, হুম, সকাল থেকেই বলছে শরীর খারাপ! যাবেনা বলছে।

রাত্রি, রাধিকার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, বলো কি সিষ্টার? এগারটায় টিফিন, দুপুরে হেভী একটা লাঞ্চ! কেউ মিস করে নাকি এইসব কনফারেন্স?

রাধিকা বললো, তোদের কাউকে তো যেতে নিষেধ করছিনা আমি। যা, যত খুশী টিফিন, লাঞ্চ কর গিয়ে।

রাত্রি বিছানায় বসে থাকা রাধিকার পাশে এসে বসলো। তারপর বললো, সিষ্টার, তুমি যদি নাই যাও, তাহলে তোমার লাঞ্চ টোকেনটা আমাকে দিয়ে দাও। কি মজা হবে! দুজনের খাবার মজা করে একা একা খেতে পারবো। কতদিন ভালো খাবার খাইনা!

ভাবতেই রাত্রির চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করে উঠলো।

রাধিকা ভেংচিয়ে বললো, রাত্রি তুই বুঝি খাবার দাবার ছাড়া কিছু বুঝিসনা, না। সেই তখন থেকেই ঘরে ঢুকেই খালি টিফিন, লাঞ্চ, এইসব কথা। কনফারেন্স কি খাবারের জন্যে? আমার লাঞ্চ টোকেন নিয়ে ভাবছিস, আমার কথা তো কিছু ভাবছিসনা? আমার এই পেটের বাচ্চার কথা?

রাত্রি খিল খিল করে হেসে বললো, তোমার পেটের বাচ্চার কথা, আমি ভেবে কি করবো, বাচ্চা তো প্রশব করবে তুমি! আমি না! আমি খালি খালি ভাবনা করবো কেনো?

ঠিক তখনই বাইরে থেকে হর্ণ বেজে উঠলো। রাত্রির হঠাৎই মনো হলো ভাড়া না দিয়ে ট্যাক্সি দাড় করিয়ে রেখেছে সে। সে সাকীবকে বললো, রাধিকা সিষ্টার না গেলে নাই, চলেন আমরা যাই, চলেন চলেন ডাঃ সাকীব, আর পেচাল করে লাভ নেই! তাড়াতাড়ি! ট্যাক্সিওয়ালা আবার বেশী ভাড়া চাইবে!

রাধিকা হঠাৎই কঁকিয়ে উঠলো। সাকীব তখনো টাই বিরস্বনায় ভুগছিলো। রাত্রি এগিয়ে গেলো রাধিকার দিকে। বললো, সিষ্টার, কি হলো তোমার?

রাধিকা বিছানার উপর লুটিয়ে পরলো।

রাত্রি বিড়বিড় করে বললো, যা ভাবিনাই তাই!

তারপর সাকীবকে উদ্দেশ্য করে বললো, ডাঃ সাকীব, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেবার ব্যাবস্হা করেন।

রাত্রি একটু থেমে বললো, ডাঃ সাকীব, এম্বুলেন্স ডাকার আর দরকার নেই, বাইরে যে আমি ট্যাক্সি দাড় করিয়ে রেখেছি, তাতে করেই আপাততঃ হাসপাতালে নিয়ে চলেন।

রাধিকাকে দেখে সাকীব, টাই তো দূরের কথা, কনফারেন্সের কথাও ভুলে গোলো। তাড়াতাড়ি, রাত্রি আর নিজে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে এনে তুললো রাধিকাকে।

এমন একটা বিশেষ কনফারেন্সের দিনে, নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের ম্যাটার্নিটি বিভাগে কোন ভালো ডাক্তার থাকার কথা না। কর্তব্যরত যে ডাক্তারটি রয়েছে, তাকে ডাক্তার সাকীবের পছন্দ হলোনা মোটেও। সাকীব রাত্রিকে বললো, রাত্রি, রাধিকাকে সার্জারী বিভাগে নিয়ে চলো। আমার প্রথম সন্তানের ডেলিভারীর কাজটা এই সব ফালতু ডাক্তারের হাতে দিতে চাইনা। আমিই নিজে করবো।

রাত্রি অনুযোগ করলো, ডাঃ সাকীব, আপনি সার্জারীর ডাক্তার, ম্যাটার্নিটিতো ভালো জানেন না।

সাকীব রেগে যাবার ভান করে বললো, রাখো তোমার সার্জারী আর ম্যাটার্নিটি? আমার প্রথম সন্তানের ডেলিভারীর কাজ তো যার তার হাতে তুলে দিতে পারিনা? তোমার মতো চার বছরের অভিজ্ঞ নার্স পাশে থাকলে আমার কোন ভাবনা নেই। চলো, চলো।

রাত্রি বললো, ডাঃ সাকীব, আমি তো সার্জারীর নার্স, ম্যাটার্নিটি আমিও ভালো বুঝিনা।

রাধিকা, পেসেন্ট বেড থেকে চেচিয়ে উঠলো, কি করবে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও।

সাকীব এবার সত্যিই রাগ করলো, আহ, রাত্রি, তুমি বেশী কথা বলো, রাধিকার অবস্হাটা দেখেছো? চলো চলো।

সাকীব আর রাত্রি দুজনে পেসেন্ট বেডটা ঠেলতে ঠেলতে সার্জারী বিভাগের দিকে এগিয়ে চললো।

রাত্রির সহযোগীতায় সাকীব রাধিকার ডেলীভারীর কাজটা সমাপন করলো। রাধিকার একটি চমৎকার ফুটফুটে কন্যা হলো।

তারো তিন মাস পরের কথা।

ডে টাইমের ডিউটি রাত্রির জন্যে সবচে বিরক্তিকর। কারন, তার সকালে ঘুম ভাঙে অনেক দেরীতে। একটা একরুমের এপার্টমেন্টে, একাকী বসবাস করে সে। আজও, ঘড়ির এলার্ম তার কানে ঢুকলো না। যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলো, ঘড়িতে বাজে পৌনে আটটা। নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া। এক মিনিটের লেইট হলেও ক্ষমা নেই। পুরো দিনের বেতন কাটা। রাত্রি লাফিয়ে নামলো বিছানা থেকে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ছুটে বেড়িয়ে পরলো বাইরে।

ষোলশহরের এক নং গেইট থেকে সিএনজি তে পনের মিনিটের পথ, নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতাল। এই সকালবেলায় সিএনজির জন্যে এখানে লম্বা লাইন ধরতে হয়। রাত্রিও সিএনজির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে। অথচ, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কোন রকম নড়াচড়া করছেনা। রাত্রি বারবার ঘড়ি দেখছে আর সামনের লোকটার উপর বিরক্ত হচ্ছে। ঐ লোকটির সামনে অন্য কেউ নেই যে, সিএনজি ভাড়া করবে। রাত্রি কি করবে কিছু বুঝতে পারছেনা। রাত্রি লোকটির মনযোগ আকর্ষণ করে বললো, এই যে ভাই, আপনি কি সিএনজির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছেন? ভাড়া না করলে, আমি কিন্তু, ভাড়া করছি!

লোকটা ফিরে তাকালো রাত্রির দিকে। অলস চোখে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। আশচর্য্য, মুহুর্তের মধ্যেই লোকটা রাত্রির গায়ের উপর লুটিয়ে পরলো। রাত্রি, কিছুই বুঝতে পারলোনা, কি হচ্ছে এসব। রাত্রি লোকটার ভারে নিজের তাল সামলাতে না পেরে লোকটাকে গায়ের উপর নিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পরলো। আশে পাশের লোকজন, ব্যাপারটা দেখে ছুটে এলো। রাত্রি কোন এক রকম নিজেকে সরিয়ে নিলো লোকটার ভারী দেহের নীচ থেকে। সবাই যখন লোকটাকে ধরতে যেতে উদ্যত হলো, তখন, নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলো রাত্রি, প্লীজ, কেউ টাচ করবেন না, প্লীজ!

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজির ড্রাইভারটা এগিয়ে এসে বললো, কি কইত লাইগগুন আফা, একখান মানুষ মেডিত পরি মরি যাইরগুই, অনে কইতে লাইগগুন, টাচ ন কইরতাম বুলি?

রাত্রি আবারো বললো, জী! প্লীজ, টাচ করবেননা। ব্রেনে কোন চোট পরে থাকলে বড় সমস্যা হতে পারে।

আশে পাশের লোকজন রাত্রির কথায় হেসে উঠলো। এই পাংকু ড্রেসের নাদুস নুদুস বোকা বোকা চেহারার মেয়েটা বলে কি? ডাক্তার টাক্তার নাকি?

রাত্রি নিজে থেকেই বললো, দেখুন, আমার এই পোষাকে, আপনারা আমাকে কি ভাবছেন জানি না। আমি একজন নার্স। আপনাদের কারো যদি মোবাইল থাকে, তাহলে হাসপাতালে একটা টেলিফোন করেন।

রাত্রি তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের একটা কার্ড বেড় করে বাড়িয়ে ধরলো, বললো, পারলে এই হাসপাতালে টেলিফোন করেন।

একজন কার্ডটা হাতে নিয়ে, টেলিফোন করতে ব্যাস্ত হয়ে পরলো। আর রাত্রি, মাটিতে লুটিয়ে পরা লোকটার হাত ধরে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলো।

এম্বুলেন্স এসে পরলো কয়েক মিনিটের মাঝেই। এই চেনা নেই জানা নেই লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পরাতে, রাত্রি মনে মনে একটু খুশীই হলো। এই লোকটার কল্যানে অন্ততঃ এম্বুলেন্সে করে ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌছা যাবে।

দীর্ঘ ছয়মাস পর রাধিকার আজ কাজে যোগদানের কথা। সে তার তিন মাসের কন্যা দিলকে কোলে নিয়ে ম্যাটার্নিটির দিকে ছুটছিলো। আপাততঃ বাচ্চা দেখাশুনার ভারটা ম্যাটার্নিটিকে দিয়ে নিশিচন্তে কাজ করতে চায় সে। সাকীব রাধিকার পেছনে পেছনে ছুটছে। রাধিকার কাজে যোগদানের ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ নয় তার। সে বারবার বলছে, রাধিকা এখনো সময় আছে বাসায় ফিরে যাও। এইসব ম্যাটার্নিটিতে বাচ্চা রেখে, কিছু একটা হয়ে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

রাধিকা পাত্তা দিচ্ছেনা সাকীবকে, সে কথা বলছে তিন মাসের দিলের সাথে, আব্বু বোকা, বেচী কতা বলে, তোমার কিচচু হবেনা দিল, আমমু চুযোগ পেলেই তোমাকে দেকতে চলে যাবো, আমার লককী মণি, দিলের টুককি দিল।

সাকীব রাগ করার ভান করলো, তোমাকে না বললাম, বাচ্চাদের সাথে ওভাবে কথা বলবেনা? বড় হলে সুন্দর মতো কথা বলতে পারবেনা!

রাধিকা পাত্তা দিচ্ছেনা সাকীবকে, হন হন করে ছুটছে। সাকীব বুঝলো, রাধিকাকে বাধা দিয়ে আর কাজ নেই। সে বললো, ঠিক আছে আমার কথা যখন শুনবেনা কি আর করার। দিলকে একবার আমার কোলে দাও।

সাকীব দিলকে কোলে নিয়ে আদর করতো লাগলো, আমার তুততু, আমার পক্কু।

রাধিকা ছো মেরে দিলকে টেনে নিলো সাকীবের কোল থেকে। বললো, এমন করে বাচ্চাদের সাথে কথা বললে মেন্টাল ম্যাচুরীটি আসবেনা। যাও, এবার কাজে যাও।

রাধিকা হন হন করে ছুটছে ম্যাটার্নিটির দিকে। সাকীবের হঠাৎই মনে হলো, দিলের দুধ আর কাপর চোপরের ব্যাগটা তার কাধে। সে পেছন থেকে ডাকলো, রাধিকা একটু দাঁড়াও।

রাধিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে রেগে বললো, আবার কি?

সাকীব বললো, তুমিতো দিলের ব্যাগের কথা ভুলে গেছো। এই নাও ব্যাগ।

রাধিকাকে দিলের ব্যাগটা দেয়ার ফাঁকে আরেকবার দিলকে আদর করতে চাইলো সাকীব। রাধিকার হাতে সময় নেই। সে ছুটতে লাগলো ম্যাটার্নিটির দিকে। সাকীব উপায় না পেয়ে নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলো।

রাত্রি জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে ষোলশহরের এক নং গেইটে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীটাকে বুঝিয়ে দিয়ে, নার্সের ড্রেস বদলের রুমের দিকে ছুটলো। তাড়াতাড়ি ড্রেস বদলে, ছুটতে ছুটতে সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনে এসে যখন ঢুকলো, ঠিক তখনি নার্স সুপারও এসে ঢুকলো তার পেছনে পেছনে। রাত্রি এমন একটা ভাব করলো যে, সে ঠিক সময়ে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে, কাজের ব্যাপারে কোন ধরনের গাফিলতি তার নেই।

নার্স সুপার মিনা রায়, বিশেষ কোন কারন ছাড়া, নার্স ষ্টেশনে আসেনা। আজ এই ডে সিফটের শুরুতেই সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনে আসার বিশেষ একটা কারন আছে।

এই বিশেষ কারনটা হলো, দীর্ঘ ছয় মাসের ম্যাটার্নিটি ছুটি ভোগ করার পর নার্স সুপারভাইজার রাধিকা, আজকে কাজে যোগদানের কথা। এই কয়দিনে নুতন অনেক নার্সও যোগদান করেছে এই সার্জারী বিভাগে। রাধিকার পুনরায় কাজে যোগদানের ঘোষনা আর নুতন নার্সদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়াটাই তার উদ্দেশ্য।

রাধিকার অবর্তমানে এতদিন, নারী ও শিশু বিভাগের সিনিয়র নার্স লতিফা ভারপ্রাপ্ত সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছে। তার ধারনা ছিলো, এই ভারপ্রাপ্ত থেকে একদিন হয়তো পুরোপুরি সুপারভাইজারের দায়িত্বটা পেয়ে যাবে সে। অথচ, নার্স সুপার মিনা রায় এসে ঘোষনা করলো, আজকে একটি বিশেষ কারনে আসলাম। রাধিকা সিস্টারের অবর্তমানে, লতিফা সিস্টারকে অনেক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলাম, তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।

লতিফা বিনয়ের সাথে বললো, না, ম্যাডাম, আমার কোন ঝামেলা হয়নি, বরং সার্জারী বিভাগে এসে নুতন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।

মিনা রায় লতিফাকে থামিয়ে বললো, তা আমি জানি। আমি নিজেও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে নার্সের কাজ করেছি। জীবনে অভিজ্ঞতার কোন শেষ নাই। তবে, যে কারনে এসেছি তা হলো, আজকে থেকে রাধিকা সিষ্টার আবারো আগের মতোই সার্জারী বিভাগের সুপারভাইজারের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

তারপর রাধিকাকে উদ্দেশ্য করে বললো, রাধিকা তোমার সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এ হলো সিষ্টার লতিফা। নারী ও শিশু বিভাগে ছিলো এর আগে। তোমার অবর্তমানে এতদিন ভারপ্রাপ্ত সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছে। সিষ্টার লতিফা কাজে খুবই পটু। আমার ইচ্ছা সিষ্টার লতিফার আর নারী ও শিশু বিভাগে ফিরে যাবার কোন দরকার নাই। সার্জারীতে সিষ্টার লতিফার মতো নার্স খুবই দরকার। আর ও হলো, সিষ্টার তাহমিনা। তিন মাস আগে নুতন যোগদান করেছে। আর আর?

মিনা রায় পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে কাকে যেনো খোঁজছে। রাত্রির মন খারাপ হয়ে গেলো। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছেনা। সে নিজে থেকেই হাত তুলে বললো, জী জী আমি। আমি হলাম রাত্রি। গত চার বছর ধরে এই সার্জারী বিভাগেই আছি।

রাধিকা রাত্রির হাতে চিমটি কেটে বললো, তোকে আর নুতন করে পরিচয় দিতে হবেনা।

মিনা রায় হাসলো। রাত্রি তোমার কোন আর পরিবর্তন হলোনা। তবে তোমার মতো এমন সাধাসিধে নার্সের খুব দরকার, কিন্তু আমি খোঁজছি অন্য একজনকে। আজকে নুতন যোগদান করার কথা, সুমি নামের একটি মেয়ে।

সিষ্টার লতিফা চেচিয়ে বললো, নুতনদের কথা আর বলবেন না ম্যাডাম। কাজের প্রতি কোন আগ্রহই নেই এদের। সময় মতো কাজে আসার মতো কোন সিনসিয়ারীটি এদের নাই।

ঠিক এমনি একটা মুহুর্তে সুমি গিয়ে পৌঁছুলো, সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনে। সুমি বললো, এক্সকিউজ মী, এটা কি সার্জারী বিভাগ?

রাত্রি ছুটে এসে বললো, জী জী, আপনার কোন সমস্যা?

সুমি বললো, আমার নাম সায়মা আখতার সুমি। আজকে থেকে নার্স হিসেবে যোগদান করার কথা এখানে।

সুমির কথা শুনে ভেতর থেকে চেচিয়ে উঠলো সিষ্টার লতিফা, এই মেয়ে? এখন বাজে কয়টা?

সুমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, জী, আটটা তেতাল্লিশ।

সিষ্টার লতিফা ভেংচি কাটলো, আটটা তেতাল্লিশ! এই নার্স ষ্টেশনে ডে সিফটের কাজ কয়টায় শুরু হয় জানো কিছু?

সুমি বললো, জী জানি। আটটা ত্রিশে। কিন্তু ড্রেস চেইঞ্জের রুমটা খোঁজে পাচ্ছিলামনা। কেউ কি বলতে পারেন কোনদিকে?

সিষ্টার লতিফা রেগে বললো, মেয়ের আহলাদে তো আর বাঁচিনা, তাকে ড্রেস চেইঞ্জের রুমটা দেখিয়ে দিতে হবে। যাও এখান থেকে। নিজে খোঁজে বের করো।

সুমির মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এমনিতেই অনেকটা মনের বিরুদ্ধে নার্সের চাকরীটা নিয়েছে সে। প্রথম দিনেই যদি এরকম ব্যাবহার আশা করতে হয়, তাহলে সে আর মন থেকে এই নার্সের কাজে ভরসা করতে পারছেনা। সে আবারো খোঁজতে গেলো ড্রেস চেইঞ্জের রুমটা।

সুমি যখন সাদা নার্সের ড্রেস পরে নার্স ষ্টেশনে ঢুকলো, তখন অবাক হয়ে দেখলো, সবাই কেমন থ হয়ে তার দিকে তাঁকিয়ে আছে। সবাই কেমন চুপচাপ। সে কোন কারন বুঝতে পারলোনা। নার্সের পোষাকে তাকে মানাচ্ছেনা নাকি? অথবা খুবই চমৎকার লাগছে নাকি! কোনটি কে জানে?

আশচর্য্য, রাত্রি এগিয়ে এসে সুমির হাটুতে একটা লাথি মেরে বললো, নার্সের ড্রেস পায়ের গিড়া পর্য্যন্ত ঢাকতে হয়, জাননা?

সুমি এতক্ষনে বুঝতে পারলো। তার সাদা রংয়ের এই নার্সের ড্রেসটা একটু খাট। একটু খাট বললে ভুল হবে। বেশ খাট। হাটু পর্য্যন্ত দেখা যায়। সুমি একটু আধুনিকা প্রকৃতির মেয়ে। শখ করে অর্ডার দিয়ে নিজের এই নার্স ড্রেসটা বানিয়েছিলো। এই ড্রেসটাতে সবাই যে, এমন বিব্রত হবে ভাবতে পারেনি সে।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে রাত্রি, এবার সবাই সারি হয়ে দাঁড়াও।

রাধিকা টেবিলের উপর থেকে নার্সদের প্রতিদিনের কর্মসূচীর খাতাটা টেনে নিতে নিতে বললো, তোমাদের সবার আজকের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আশচর্য্য, ওপাশ থেকে লতিফা ছুটে এসে খাতাটা টেনে ধরলো, বললো, থামেন সিষ্টার রাধিকা। নার্সদের কাজ বুঝিয়ে দেবার দায়ীত্বটা আমার।

রাধিকা খাতাটা নিজের দিকে টেনে ধরে বললো, কেনো? আমি এই নার্স ষ্টেশনের সুপারভাইজার! এই দায়ীত্ব আমার।

লতিফা খাতাটা নিজের দিকে টেনে বললো, তা ঠিক, কিন্তু আপনি এতদিন ছিলেন না, তাই কিছুই জানেননা। আগে আমার কাছ থেকে কাজ বুঝে নিন।

রাধিকা খাতাটা নিজের দিকে টেনে বললো, তোমার কাছ থেকে আমি কাজ বুঝে নেবো? বলো কি তুমি?

মিনা রায় সুমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তখনো অপেক্ষা করছিলো। রাধিকা আর লতিফার বাঘে মোষের লড়াই দেখে কেটে পরলো। আর, রাধিকা আর লতিফার খাতা টানাটানিতে খাতাটা একসময়ে ছিড়েই গেলো। দুজনেই ছিটকে পরলো মাটিতে। আর রাত্রি এতে করে আনন্দে খিল খিল করে হাসতে লাগলো, আর হাতে তালি দিতে লাগলো।

রাধিকা উঠে দাঁড়ালো। রাত্রিকে ধমক দিয়ে বললো, রাত্রি হাসি থামাও! এটা নার্স ষ্টেশন! ফান করার জায়গা না!

সাকীবের কাজে মন বসছেনা কিছুতেই। টেবিলের উপর এক তোজ এক্সরে ফিল্ম জমা হয়ে আছে। সে টেবিলের উপর রাখা দিলের বাঁধানো ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ম্যাটার্নিটিতে তার তিন মাসের মেয়েটা, না জানি কি করছে? কাঁদছে নাকি অনবরত কে জানে?

ডাক্তার আশেক সার্জারী বিভাগের সিনিয়র সার্জন। সে বারবার বলছে, আজকে না ইন্টার্নীর এক ডাক্তার যোগদান করার কথা? আপনার সাথে তার কি দেখা হয়েছে?

আশেকের কথা মোটেও কানে ঢুকছেনা সাকীবের। সাকীবের অন্যমনস্কতায়, আশেকের মেজাজ খারাপ হচ্ছে। সে অনেকটা চিৎকার করে বললো, ডাঃ সাকীব, শুনতেছেন কিছু আমার কথা?

সাকীব থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে একটা এক্সরে ফিল্ম হাতে নিয়ে বললো, না এই এক্সরে রিপোর্টটার কথা ভাবছিলাম, কিছু বলছিলে নাকি তুমি?

আশেক বললো, ডাঃ সাকীব এক্সরে ফিল্ম উল্টো ধরেছেন।

সাকীব লজ্জা পেয়ে গেলো, অথচ প্রকাশ করলোনা। বললো, আসলে এক্সরে দেখতে হয় উল্টো করে। শুধু উল্টোই না, বিভিন্ন এংগেল থেকে দেখতে হয়।

আশেক বললো, বুঝি বুঝি ডাঃ সাকীব। আমি বিয়ে না করলে কি হবে? বাচ্চা কাচ্চা না থাকলে কি হবে? সবই বুঝি। আপনার মনটা পরে আছে আপনার মেয়ের উপর।

সাকীব বললো, ঠিকই বলেছ ডাঃ আশেক, মেয়েটা আমার, অনেক মায়া নিয়ে!

সাকীবের কথা শেষ না হতেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সাকীব রিসীভারটা ধরতে যাবে, তার আগেই আশেক তুলে নিলো সেটা।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে কথাগুলো শুনে আশেক চেচিয়ে উঠলো, কি? ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি আসছি। আশেক রাগে খুট করে রিসীভারটা রাখলো ক্রাডলে।

সাকীব বললো, কি ব্যাপার আশেক, তোমাকে এত উত্তেজিত লাগছে কেনো?

আশেক বললো, আর বলবেননা ডাঃ সাকীব। আমি এতক্ষণ ধরে নুতন ঐ ইন্টার্নীর ডাক্তারটার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি, আর এখন শুনি সে নাকি জরুরী বিভাগে অজ্ঞান হয়ে পরে আছে। যাই দেখি কি অবস্হা এখন।

আশেক জরুরী বিভাগে এসে কর্তব্যরত নার্সকে বললো, অজ্ঞান হবার কারন বুঝা গেছে?

নার্স বললো, কারন বড় কিছু না। ডাক্তার যা বলেছেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। ভিটামিনের অভাব। মনে হয় বেচারা দুদিন কিছু খায়নি।

আশেক বেডের উপর শুয়া, নবাগত ইন্টার্নীর গালে চাপর মেরে জাগানোর চেষ্টা করলো। সে একবার চোখ খোলে বললো, গুড মর্ণিং।

তারপর আবারো চোখ বন্ধ করলো। আশেকের মেজাজ খারাপ হতে লাগলো। সে ইন্টার্নীর গালে আরেকটা চাপর মারলো। বললো, এই ভিটামিনের রোগী, উঠ। ক্যান্টিনে গিয়ে নাস্তা করে কাজে এসো।

ইন্টার্নী আবারো চোখ খোলে বললো, নাস্তা করার মতো পয়সা নাই, ভাইয়া।

আশেক রাগ করার ভান করে বললো, তুমি কি আমার সাথে ফান করছো? তুমি জানো আমি কে? আমি ডাঃ আশেক! আজ থেকে আমার আণ্ডারে তোমার কাজ করার কথা।

আশেকের কথা শুনে ইন্টার্নী লাফিয়ে উঠে বসলো। বললো, স্যরি, স্যার!

ইন্টার্নী বেশীক্ষন বসে থাকতে পারলোনা। আবারো শুয়ে পরলো।

দুপুরে লাঞ্চের সময়, ক্যান্টিনের ঐ সাজানো সদ্য ভাজা বড় বড় আলুর চপগুলোর লোভ সামলাতে পারছিলোনা রাত্রি। সে বড় বড় দেখে চারটি আলুর চপ তুলে নিলো নিজের প্লেটে। পেছন থেকে রাধিকা বললো, রাত্রি, তুই আসলেই একটা পেটুক!

রাত্রি বললো, খাবার দাবার ছাড়া দুনিয়াতে আর মজার কি আছে বলতো সিষ্টার।

রাধিকা বললো, হুম, তোকে যখন মজা করে খেতে দেখি, আমারো তখন তাই মনে হয়।

রাধিকা আর রাত্রি খালি দেখে একটা টেবিলে এসে বসতেই চোখে পরলো, খাবার ট্রে নিয়ে সাকীব এগিয়ে আসছে এদিকেই। সাথে ইয়াংগ বয়সের একটা লোক। সাকীব টেবিলের ওপাশে, রাধিকা আর রাত্রির সামনা সামনি বসতে বসতে

বিড়বিড় করে বললো, রাধিকা, তোমাকে বললাম, বাসায় থেকে আমার মেয়েটার যত্ন নিতে, তুমি শুনলেনা। এখন মেয়েটা আমার ম্যাটার্নিটিতে কি করছে কে জানে।

সাকীবের বিড়বিড়ানীর মাঝেই, রাত্রি ইয়াংগ বয়সের লোকটাকে আঙুলি নির্দেশ করে চেচিয়ে বললো, আরে তুমি?

সাকীব বললো, কি রাত্রি? চিনো নাকি ওকে?

রাত্রি বললো, চিনবোনা মানে? আমি হাসপাতালে আসার পথে এই লোকতো অজ্ঞান হয়ে আমার গায়ের উপর পরেছিলো।

সাকীব বললো, আর বলোনা রাত্রি। আমাদের এই সার্জারী বিভাগে নুতন ইন্টার্নী। বেচারা বেশ মেধাবী, তবে গরীব। টাকা পয়সা নেই বলে দুদিন ধরে নাকি কিছু খায়নি। ভিটামিনের অভাবে অজ্ঞান হয়েছিলো।

রাত্রি ইয়াংগ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, দুদিন ধরে খাননি বুঝি?

ইয়াংগ লোকটি ভাতের বাউল থেকে নিজের প্লেটে উপচে উপচে করে ভাত নিয়ে, মুখের ভিতর এক লোকমা পুরে দিয়ে বললো, হুম, খুলনা থেকে বাসে করে ঢাকা, ঢাকা থেকে রাতের ট্রেনে চিটাগং, সাথে টাকা পয়সা যা ছিলো গাড়ী ভাড়াতেই শেষ হয়ে গেছে। সকালের নাস্তা অবশ্য আশেক স্যারে করিয়েছেন। পেট ভরেনি। দুপুরে এই স্যার লাঞ্চ করাবে বলেছে, তাই স্যারের সাথে চলে এলাম।

ইয়াংগ এই লোকটিকে সাদা ভাত খাপুশ খুপুশ খেতে দেখে রাত্রির মনটা মমতায় ভরে উঠলো। সে অতি শখ করে চারটি আলুর চপ মজা করে খাবে বলে তুলে এনেছিলো। লোকটিকে দেখে বললো, শুনুন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার থেকে একটি চপ নিতে পারেন।

ইয়াংগ লোকটির চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠলো, সে কোন কথা না বলেই দুটো আলুর চপ তুলে নিলো, রাত্রির প্লেট থেকে। রাত্রি চিৎকার করে উঠলো, তোমাকে বললাম একটা, দুইটা নিলে কেনো?

ইয়াংগ এই লোকটির সাথে রাত্রির বনিবনা দেখে, রাধিকা সাকীবকে চোখের ইশারা করলো, চলো অন্য টেবিলে যাই।

মুখে রাত্রিকে বললো, রাত্রি স্যরি, তোর এই সাকীব ভাইয়ের সাথে খাবারের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে আমার। আমি যাইরে।

সাকীব রেগে উঠে দাঁড়ালো। বললো, তোমার সাথে খেতে বসতে আমার বয়েই গেছে।

সে রাগে ইন্টার্নীকে উদ্যেশ্য করে বললো, এই ইন্টার্নী তুমি পেট ভরে খাও, আমি গেলাম।

দুপুরের লাঞ্চের পর নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনে একটা ছোটখাট সমস্যা দেখা দিলো। সমস্যাটা হলো সুমি নামের নবাগতা নার্সটিকে নিয়ে। এই হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী নবাগতা নার্সদের তদারকী করার জন্যে অভিজ্ঞ কাউকে দায়ীত্ব দেয়া হয়। সুমির দেখাশুনার দায়ীত্ব কাকে দেয়া হবে, এটাই হলো মূল সমস্যা।

সার্জারী বিভাগের নার্স ষ্টেশনের সুপারভাইজার রাধিকা, রাত্রিকে একটু অন্য চোখে দেখে। অনেকটা নিজের আপনজনের চাইতেও বেশী। চার বছর ধরে রাত্রি এখানে জুনিয়র নার্স হিসেবে আছে, অথচ, তার অধীনে এখনো কোন নার্স নেই। নার্স হিসেবে রাত্রির আরো অভিজ্ঞতা হউক, এটা সে মনে প্রানে চায়। অথচ, বাধ সাধছে ঐ কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরা এতদিনের ভারপ্রাপ্ত সুপারভাইজার লতিফা। চার বছরের অভিজ্ঞতার চাইতেও, আনাড়ী একটা নার্সের কাছে নবাগতা একজন নার্সের দায়ীত্ব দেবার পক্ষপাতী সে কিছুতেই না।

লতিফা বললো, সিস্টার রাধিকা, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে ঐ নবাগতা নার্সের তদারকীর দায়ীত্বটা আমি নিজেই নিতে পারি। নবাগতাদের জন্যে প্রাথমিক প্রশিক্ষণটা খুবই জরুরী।

রাধিকা বললো, কি বলছো লতিফা, তুমি একজন সিনিয়র নার্স, তোমাকে নবাগতা নার্সের দায়ীত্ব দিয়ে অপমান করতে চাইনা।

রাধিকা একটু থেমে রাত্রিকে ডাকলো, রাত্রি, সুমির দেখাশুনা করার দায়ীত্ব তোমাকে দিলাম, কি বলো?

রাত্রির চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করে উঠলো, বললো, কি বলো সিস্টার! আমি?

লতিফা চেচিয়ে উঠলো, বলেন কি সিস্টার রাধিকা! রাত্রির পক্ষে নবাগতা নার্সের দায়ীত্ব নেয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

রাধিকা বললো, রাত্রি, তুমি কি মনে করো?

রাত্রি লতিফাকে মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, ঐটা কোন ব্যাপারই না আমার জন্যে। তবে,

রাত্রি থেমে গেলো হঠাৎই। তাকে কেমন যেনো বিব্রত মনে হচ্ছে।

রাধিকা কঠিন কন্ঠে বললো, রাত্রি, কোনটা? পারবে কি পারবেনা সরাসরি বলো।

রাত্রি সরলতাপূর্ণ ভাবে হাসতে হাসতে বললো, অবশ্যই পারবো। আমি চার বছরের অভিজ্ঞ নার্স বলে কথা!

সুমি খুব বিরক্ত হলো। বোকা বোকা ধরনের একটা মেয়ে, তার কাছে শিখতে হবে? চাকরী যখন এটা, তখন সুপারভাইজারের আদেশ পালন না করে উপায় নেই। সুমি একটু উপহাস করেই বললো, আমাকে তাহলে কি করতে হবে, সিস্টার রাত্রি?

রাত্রি কিছুটা কঠিন সুরে বললো, ঐ দেখছোনা ট্রলিটা? ঐটা ঠেলে আমার সাথে তিনশ এগার নম্বর ওয়ার্ডে চলো।

সুমি খানিকটা মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, ঠিক আছে সিস্টার, চলেন!

নার্স ষ্টেশনের বাইরে এসে রাত্রি বললো, এই মেয়ে, তুমি নিজেকে কি মনো করো?

সুমি বললো, কেনো সিস্টার, আমি আবার কি করলাম?

রাত্রি বললো, এইটা হলো হাসপাতাল, এখানে ফ্যাশন করার জায়গা না।

সুমি বললো, ফ্যাশন কোথায় করলাম সিস্টার?

রাত্রি বললো, এই যে তোমার নার্স ড্রেস! দেখলে মনে হয় ফ্যাশন শো এর স্টেজে নেমেছো।

কথাগুলো বলেই রাত্রি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পরলো। সুমির মনে হলো, সে অতীতের কোন কথা মনে করছে। ফ্যাশন সংক্রান্ত কোনো জটিলতা তার জীবনে আছে কি না কে জানে? সুমি বললো, কি হলো সিস্টার রাত্রি?

রাত্রি গম্ভীর হয়ে বললো, কিছু না। তুমি যে রকম নার্সের কাজ সহজ মনে করছো, নার্সের কাজ অত সহজ না। এখন থেকে আমি তোমাকে এমন টাইট দিব যে, ফ্যাশন ট্যাশন সব ভুলে যাবে।

সুমি ভয় ভয় একটা চেহারা করে বললো, সিস্টার, আপনি বুঝি খুব রাগী, তাই না?

রাত্রি আরো গম্ভীর হয়ে বললো, রাগের আর দেখেছো কি? এই তো শুরু।

রাত্রি বুক টান করে প্রফেশনাল নার্সের মতো হাটতে লাগলো। তার পিছনে হাটতে হাটতে আঙুল আর চোখ পেঁচিয়ে ভ্যাংচি কাটলো সুমি।

হাসপাতালের বারান্দা ধরে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে রাত্রির পেছনে পেছনে কিছুদূর যেতেই বাম পাশের একটা রুম থেকে বেড়িয়ে এলো সাকীব। তাকে দেখেই খুব গর্বে ভরা গলায় ডাকলো রাত্রি, ডাঃ সাকীব!

রাত্রির ভাবসাবটা এমন যে, তার আণ্ডারে নবাগতা নার্স আছে।

সাকীব রাত্রির সাথে নবাগতা মেয়েটিকে দেখে বললো, কি ব্যাপার রাত্রি, নুতন সিস্টার বুঝি!

রাত্রি আনন্দে গদগদ করতে লাগলো। বললো, জী ডাঃ সাকীব, ওকে দেখাশুনা করার দায়ীত্ব আমার উপর পরেছে।

সাকীব সুমির প্রায় গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বললো, হুম, চমৎকার মেয়ে তো? চেহারাও বেশ মিষ্টি। চটপটে মেয়ে মনে হচ্ছে।

রাত্রি রাগ করার ভান করলো, বললো, ডাঃ সাকীব, নবাগতাদের সাথে অমন করে কথা বললে লাই পেয়ে মাথায় উঠবে। কোন কাজ করবেনা।

সাকীব হাসলো, বললো, রাত্রি দেখছি রাতারাতি সিনীয়র নার্স হয়ে গেছো।

রাত্রি একটু ক্ষুন্ন হয়ে বললো, ডাঃ সাকীব, আমাকে কিন্তু আপনি অপমান করছেন?

সাকীব বললো, না না রাত্রি, তুমি সব সময় খুব সীনসিয়ার আর সীরীয়াস, তা আমি জানি।

রাত্রি মনে মনে একটু খুশীই হলো, অথচ, মুখে বললো, খুশী হতে পারলাম না বলে দুঃখিত ডাঃ সাকীব, চলি। এই মেয়েটাকে কিছু শিখিয়ে আনি।

সার্জারী বিভাগে তিনশ এগার নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমান রোগীর সংখ্যা পাঁচজন। বাবুল, বাদশা, রতন, মাহবুব সাহেব আর রহমান সাহেব। রহমান সাহেবের বয়স পঞ্চাশের উপর হবে, আর মাহবুব সাহেবের বয়স বুঝা যায়না। কখনো মনে হয় ত্রিশ। আবার কখনো মনে হয় অনেক বেশী। বাবুল, বাদশা আর রতনকে দেখে মনে হয় ছাত্র প্রকৃতির। কেনো যেনো মনে হয়, মারামারি করে কিছুটা আহত হয়ে হাসপাতালে সময় কাটাচ্ছে। মোটেও অসুস্থ মনে হচ্ছেনা সুমির কাছে। তিনজনই বাবুলের খাটের উপর বসে দিব্যি তাশ খেলছে। স্যালাইনে রাখা রহমান সাহেব আধশুয়া হয়ে তাদের আনন্দে অংশ নিচ্ছে। আর এই কক্ষের ভেতর ঢুকার পর, সুমির যা মনে হলো, বাবুল, বাদশা, রতন, ওই তিনজনের, শুধুমাত্র রাত্রির সুশ্রী চেহারাটা আর

বোকা বোকা কথার জন্যেই হাসপাতাল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছেনা। তিনজনই রাত্রিকে কক্ষে ঢুকতে দেখে একটা হৈ চৈ শুরু করে দিলো। আর নবাগতা এই নার্সটিকে দেখে একসংগে বলে উঠলো, সিস্টার, নুতন সিস্টার নাকি?

রাত্রি বললো, হুম, আজকে থেকে। ওর নাম?

রাত্রি কিছু বলার আগেই সুমি বললো, সুমি।

বাদশা বলে উঠলো, ও, সুমি! চমৎকার নাম। আমি জানি সিস্টার সুমি, আপনি জানতে চাইবেন, আমি হাসপাতালে কেনো আছি? আপনার অবগতির জন্যে বলছি, আমি খুব ভালো ছেলে। রাজনীতীর ধারে কাছে আমি নাই। কিছু দুষ্টু ছেলে আমার বিরুদ্ধে ষরযন্ত্র করেছে। ষরযন্ত্র করে অবশ্য বেশী ক্ষতি আমার করতে পারেনি।

রাত্রি থামিয়ে দিলো বাদশাকে, বুঝেছি বুঝেছি, নুতন নার্স দেখে আপনার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলি কি শুনেন বাদশা ভাই, হাসপাতাল থেকে রিলীজ পেলে, ঐ বদমাশগুলোকে এমন একটা পিটা?

রাত্রি কথা শেষ করার আগেই ওপাশের বেডের রাহমান সাহেব চেঁচিয়ে উঠলো, এই মেয়ে, এত কথা বলো কেনো? আমার স্যালাইন যে শেষ হয়ে গেছে, খবর আছে?

রাত্রি দুঃখ দুঃখ একটা চেহারা করে বললো, স্যরি রহমান সাহেব, ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপর সুমিকে খুব গম্ভীর গলায় বললো, এই সুমি, উনার স্যালাইনটা চেইঞ্জ করে দাও।

সুমি ট্রলীটা ঠেলে রহমান সাহেবের কাছে যেতেই, রহমান সাহেব হাত সরিয়ে নিলো।

রাাত্রি বললো, কি হলো, রহমান সাহেব?

রহমান সাহেব রেগে বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? নুতন একজন নার্সকে দিয়ে আমার স্যালাইন চেইঞ্জ করাবে?

সুমির মাথায় রক্ত উঠে গেলো। বলে কি এই বুড়ু। সুমি বললো, স্যালাইন চেইঞ্জ করার মতো সাধারন কাজটা আমি ভালোই জানি। হাতটা দিন তো দেখি।

সুমি যতই রহমান সাহেবের হাত টানছে, বুড়ুটা ততই হাত সরিয়ে নিচ্ছে। রাত্রি হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে বললো, রহমান সাহেব! নার্স নুতন পুরাতন বলে কথা নেই। নুতনদেরও সব শিখতে হবে। আপনারা সাহায্য না করলে নুতনেরা শিখবে কি করে বলুন তো?

রহমান সাহেব একটু ইতস্ততঃ করে বললো, তাইতো! ঠিক আছে, দাও মা দাও, চেইঞ্জ করে দাও।

সুমি যখন রহমান সাহেবের স্যালাইনটা চেইঞ্জ করছিলো, তখন মাহবুব সাহেব রাত্রিকে ইশারা করে ডাকলো, এই রাত্রি, ও কি নুতন সিস্টার নাকি?

রাত্রি খুব আগ্রহের সাথে বললো, হুম, এখন থেকে আমার আণ্ডারে কাজ করবে!

মাহবুব সাহেব বললো, হুম, মেয়েটার পা তো খুব সুন্দর!

রাত্রির মেজাজ খারাপ হলো মাহবুব সাহেবের কথা শুনে। সে তার নার্স ড্রেসটা হাটু পর্যন্ত তুলে বললো, পায়ের ব্যাপার হলে, আমার পা আরো সুন্দর!

মাহবুব সাহেব খুব গম্ভীর হয়ে বললো, রাত্রি পা কেটেছো কিভাবে?

রাত্রি বললো, কেনো? কেনো? পা কাটবো কেনো?

মাহবুব সাহেব বললো, না, ব্যাণ্ডেজ করা যে, তাই বললাম।

রতন, বাদশা আর বাবুলও তার পায়ের দিকে তাঁকিয়ে বললো, হ্যা হ্যা, সিস্টার, আপনার পায়ে ব্যাণ্ডেজ!

রত্রির মনে পড়লো, গত রাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে, পা ফসকে পরে গিয়েছিলো। আর সামান্য পা ছিলে গিয়েছিলো।

রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেলো। পা কেটে ব্যাণ্ডেজ করার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলো সে।

এদিকে রহমান সাহেব সুমির নার্স ড্রেসটা টেনে কেমন যেনো চুপি দিতে চাইছে। সুমির গেলো মেজাজ খারাপ হয়ে। সুমি স্যালাইনের পাইপটাতে একটা হ্যাচকা টান দিলো। রহমান সাহেব কঁকিয়ে উঠলো, বললো, কি করছো এই সিস্টার?

সুমির রাগ থামছেনা। সুমি রহমান সাহেবের বালিশের পাশে রাখা হট ওয়াটারের ব্যাগটা নিয়ে তার মাথায় আঘাত করতে থাকলো অনবরত, আর বলতে থাকলো, বদমাশ, হারামজাদা। রাাত্রি ছুটে এলো সুমির দিকে। সে হট ওয়াটারের ব্যাগটা সুমির হাত থেকে টেনে সরিয়ে নিতে চাইছে। সুমি কিছুতেই ছাড়ছেনা। রত্রি যতই হট ওয়াটারের ব্যাগটা সুমির কাছ থেকে

সরিয়ে নিতে চাইছে, সুমি ততই প্রাণপনে, সেটা ধরে রাখতে চাইছে, রহমান সাহেবের মাথায় আরো কয়েকটা আঘত করার জন্যে। টানাটানির মাঝে এক পর্যায়ে, হট ওয়াটারের ব্যাগটা সুমির হাত ছাড়া হয়ে গেলো। আর সংগে সংগে হট ওয়াটারের ব্যাগের ছিপিটা খুলে ভিজিয়ে দিলো রাত্রির নার্স ড্রেসটা। রাত্রির ড্রেস ভিজে যেতেই, হাসপাতালের এই কক্ষের সবাই হাসিতে ফেটে পরলো। তাদের হাসি দেখে সুমিও তার হাসিটা চেপে রাখতে পারলোনা। রাত্রি তখন, একটা বাচ্চা মেয়ের মতো কেঁদে ফেললো। সে ক্ষোভে, রাগে, অভিমানে কক্ষ থেকে বেড়িয়ে গেলো মাথা নীচু করে।

সুমি নুতন উদ্দ্যমে রহমান সাহেবের স্যালাইন চেইঞ্জ করে বের হয়ে গেলো রোগীদের কক্ষ থেকে। রোগীদের কক্ষ থেকে বেড়োতেই চোখে পরলো, বারান্দার ওপাশ থেকে এগিয়ে আসছে রাত্রি। আশচর্য্য, তার পরনে যে নার্সের ড্রেস, তা সুমির ড্রেসের চাইতেও খাট। উরু দেখা যায়। সে বীর দর্পে সুমির দিকে এগিয়ে এলো। তারপর, সুমির গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বললো, এই মেয়ে, তুমি মনে করেছো, ফ্যাশন সেন্স বুঝি তোমারই আছে? তাই না?

সুমি রাত্রির কথা কিছুই বুঝতে পারলোনা। সুমি বললো, সিস্টার, কি হলো আপনার, এই খাট ড্রেসে তো আপনার সর্দি লেগে যাবে!

রাত্রি চোখ বড় বড় করে বললো, বেশী দেমাগ দেখাবেনা বলে দিলাম। এই হাসপাতালে খাট নার্স ড্রেস আমিই প্রথম পরেছি। নিজেকে এতো বড় মনে করবে না।

সুমি বললো, আমি তো নিজেকে বড় বলছি না, সিস্টার!

রাত্রি বললো, তুমি আমার কাপর ভিজিয়েছো, ভালোই করেছো। তোমার অহংকার একটু কমবে। এই দেখো এইটা হচ্ছে চার বছর আগের ড্রেস। এই হাসপাতালের রোগীরা, আমার এই ড্রেস দেখেই অর্ধেক ভালো হয়ে যেতো, হুম!

সুমি বললো, আমি আবার অহংকার করলাম কোথায়?

রাত্রি বললো, তুমি মুখে না বললে কি হবে, তোমার চেহারা দেখে আমি সঅঅঅঅব বুঝতে পারি। তুমি আমকে পাাাত্তাইইইইইইইই দিচ্ছোনা।

সুমির কি হলো কে জানে? সে ও রেগে গেলো, বললো, তোমার মতো বোকা হাবা একটা মেয়েকে পাত্তা দিতে আমার বয়েই গেছে!

রাত্রি সুমির গায়ের উপর পরে এসে বললো, এইতো, এইতো, সত্যি কথা বেড়িয়ে গেছে।

সুমি কিছু একটা বলতে যাবো, ঠিক তখুনি, রাধিকার গলা শুনা গেলো, এই রাত্রি, হচ্ছে কি এসব?

রাত্রি কাঁদতে কাঁদতে বললো, দেখোনা সিস্টার, ও আমাকে বোকা হাবা মেয়ে বলছে।

রাধিকা রাত্রির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলোনা। সে সুমিকে বললো, এই সুমি, তুমি নার্স ষ্টেশনের ভেতরে যাওতো।

তারপর, রাত্রিকে বললো, তুই না সুমির তদারককারী, তুই যদি এমন করে কাঁদিস, তাহলে তো ঐ লতিফার কাছে আমার মান সম্মান আর রইলনা।

রাাত্রি রাধিকাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

রাধিকা রাত্রিকে একটা ধমক দিয়ে বললো, হয়েছে! আর কাঁদতে হবে না। এখন চল, ক্যান্টিনে যাই, চা খাব ভেবেছিলাম।

ক্যান্টিনে যেতে যেতে রাধিকা বললো, আগে জানলে তোকে এই, এতবড় দায়ীত্বটা আমি দিতাম না।

রাত্রি বললো, কেনো সিস্টার, আমার কি দোষ? ঐ মেয়েটাই তো আমার ড্রেস ভিজিয়ে দিয়েছে।

রাধিকা একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়লো, বললো, এই চার বছরে তোর কোন উন্নতি হলো না।

রাত্রি রাগ করলো, বললো, উন্নতি হয়নি বলছো কেনো সিস্টার, আমার অনেক উন্নতি হয়েছে।

রাধিকা বললো, আচ্ছা তাহলে বল শুনি, কি উন্নতি হয়েছে তোর?

রাত্রি বলতে শুরু করলো, কেনো? স্যালাইন চেইঞ্জ করতে পারি। রক্ত চাপ মাপতে পারি, তারপর, তারপর,

রাত্রি ভাবতে লাগলো, আর কি কি জানে সে। রাধিকা ধমক দিলো কঠিন ভাবে, এবার থামতো রাত্রি। তোকে নিয়ে আমার, আজ থেকে কি সমস্যা যে হবে, তুই ভাবতেই পারতেছিসনা। থাক, সে কথা। তোকে বলে কোন কাজ নেই। এবার বল, কি খাবি?

রাত্রি খুব খুশী হয়ে বললো, তুমি আজকে খাওয়াবে নাকি সিস্টার? এই না হলে কি সার্জনের ওয়াইফ?

রাধিকা আবারো ধমক দিলো, তোর যে কখন বুদ্ধি হবে?

রাত্রি রাগ করার ভান করলো, তুমি আমাকে বোকা বলছো, তাই না সিস্টার? আমি তাহলে গেলাম। আমার অনেক কাজ। ঐ সুমি মেয়েটাকে একটা টাইট দিতে হবে।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে যা, সুমিকে ভালোমতো একটা টাইট দিবি। আমার আবার ফ্রুটস কেইক খেতে ইচ্ছে করছে। কেইকটা খেয়ে দেখতে যাবো, কেমন টাইট পেয়েছে সুমি।

রাত্রি বললো, ফ্রুটস কেইক খাবে নাকি? আমারো খুব খেতে ইচ্ছে করছে, আমি তাহলে খেয়েই যাই।

আজ এই হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে নুতন অনেক ডাক্তার এবং নার্স যোগদান করেছে। এই নুতন ডাক্তার এবং নার্সদের সৌজন্যে রাতে একটা ডিনার পার্টির আয়োজন আছে। এমন একটা নোটিশ সুমির হাতেও এসেছিলো। সুমি তেমন পাত্তা দেয়নি।

যখন সাড়ে চারটা বাজলো, তখন ডে সিফটের ডিউটি শেষ। রাধিকা, তড়িঘড়ি করছে ম্যাটার্নিটিতে রাখা তার তিনমাসের মেয়ে দিলকে আনার জন্যে। লতিফা রাধিকাকে বললো, সিস্টার, আজতো নবাগতদের বরন পার্টি, যাবেননা আপনি?

রাধিকা বললো, স্যরি, আমার মেয়েকে আনতে যেতে হবে, আমি যেতে পারবোনা।

লতিফা বললো, আপনি হলেন নার্স সুপারভাইজার, নার্সদের সবার পক্ষ থেকে মোটা অংকের টাকাটা তো আপনাকেই দিতে হবে। আপনি না গেলে কেমন করে হয়।

রাধিকা বললো, টাকার কথা ভেবোনা, পার্টিতে যে বিল আসবে, তা আমাকে জানাবে, আমি দিয়ে দেবো। এখন আমি যাই। আমার দিল না জানি কি করছে?

সুমি তার ডিউটি শেষ হয়েছে ভেবে বিদায় নিতে যেতেই তাহমিনা বললো, আজকে তো ডিনার পার্টি আছে, যাবেনা তুমি?

সুমি বললো, আজকে আমার নুতন চাকরী বলে, বাসাতেও ডিনার পার্টি আছে, যাই।

তাহমিনা, লতিফাকে বললো, দেখলেন সিস্টার, মেয়েটা কেমন বেয়াদপ, মুখের উপর কথা বলে চলে গেলো।

লতিফা বললো, হুম, যেমন সুপারভাইজার, তেমনি আর কি। সুপারভাইজারই যদি ডিনার পার্টিতে না যায়, নবাগতেরা যাবে কেনো?

রাধিকা দিলকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটে বেড়িয়ে বাড়ীর পথে ছুটছিলো। পেছন থেকে রাত্রি ডাকলো, সিস্টার, আজকে যে ডিনার পার্টি আছে, সেই রেষ্টুরেন্টের নাম জানো?

রাধিকা হাটতে হাটতে বললো, তোর কি যাবার ইচ্ছে নাকি?

রাত্রি বললো, যাবোনা কেনো? সবাই কি মজার মজার খাবে, আমি কেনো বাদ পরবো?

রাধিকা রাগ করলো, রাত্রি, তুই খাবার দাবার ছাড়া কিছুই বুঝিসনা। ঐ ডিনার পার্টিতে আজকে যারা যাবে, তারা হলো এই হাসপাতালের অকাজের মানুষগুলা। গেলে যা।

রাত্রি বললো, তুমি আজকাল আমার উপর বেশী রাগ করছো দেখছি। ঠিক আছে যাবোনা। আজকে তোমার সাথে ডিনার করবো।

সাকীব, ইন্টানী আহমেদকে নিয়ে ঢুকলো একটা চাইল্ড শপে। আহমেদের ক্ষিধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। সাকীব চাইল্ড শপে ঢুকে কার্টের মাঝে বাচ্চাদের এটা সেটা রাখছে। আহমেদ সেই কার্টটা ঠেলে ঠেলে সাকীবের পেছনে পেছনে চলছে। পাম্পার্স এরিয়ার কাছে এসে সাকীব থামলো। দু ধরনের পাম্পার্স হাতে নিয়ে আহমেদকে বললো, বলোতো আহমেদ, কোনটার কোয়ালিটি ভালো হবে?

আহমেদ বিব্রতবোধ করলো। বাচ্চাদের পাম্পার্স সে কি করে বুঝবে? সে বললো, বাচ্চাদের জিনিষ সবইতো এক, ভেজাল থাকার কথা না।

সাকীব বললো, তুমি ভালো কথা বলো, কিন্তু দিল আমার প্রথম এবং একমাত্র মেয়ে। তার জন্যে তো যেমন তেমন জিনিষ কিনতে পারিনা। ডাক্তার সাকীব অন্য ধরনের আরেকটা পাম্পার্সের ঝুলি নিয়ে বললো, এই টা কেমন মনে হয় তোমার কাছে?

আহমেদ বললো, তাহলে, এই দোকানে যত ধরনের পাম্পার্স আছে, সবগুলো কিনে ফেলেন। পাম্পার্সের উপর একটা গবেষণাও হয়ে যাবে।

সাকীব, আহমেদের পিঠে আলতো একটা চাপর মেরে বললো, তুমি আসলেই একটা ট্যালেন্ট, তোমাকে দিয়ে হবে। এই আমি সবগুলোই কিনে নিলাম। রাধিকা আর কোন অভিযোগ করতে পারবেনা আমাকে।

শপিং শেষ করে, আহমেদকে নিয়ে সাকীব যখন মুসা মিয়ার রেষ্টুরেন্টে ঢুকলো, তখন অবাক হয়ে দেখলো, ওপাশের টেবিলে, খাবারের অপেক্ষায় বসে আছে রাধিকা, সাথে রাত্রি। সাকীবের মাথা খারাপ হয়ে গেলো রাধিকাকে দেখে। সে উত্তেজিত হয়ে রাধিকার দিকে এগিয়ে বললো, তুমি এখানে?

রাধিকা বললো, অবাক হবার কি আছে, এখানে খেতে আসা তো নুতন কিছু না।

সাকীব রেগে আগুন হয়ে বললো, সবসময় আর এখন, এক কথা হলো নাকি? আমার দিল কোথায়?

দিলকে পাশের চেয়ারে শুইয়ে রেখেছিলো রাধিকা। সে দিলকে দেখিয়ে বললো, এই তো এখানেইতো। দেখো, কেমন ঘুমুচ্ছে।

সাকীব ছু মেরে দিলকে কোলে তুলে নিলো। বললো, তুমি আসলেই একটা, আসলেই একটা।

সাকীব রাগে থর থর করছে।

রাধিকা বললো, কি? কি হলো তোমার হঠাৎ?

সাকীব বললো, তিন মাসের বাচ্চাকে নিয়ে কি কেউ রেষ্টুরেন্টে খেতে আসে?

সাকীব দিলকে কোলে নিয়ে হন হন করে বেড়িয়ে গেলো রেষ্টুরেন্ট থেকে।

রাধিকা একটা ঝামেলার মাঝে পরে গেলো। সে রাত্রিকে বললো, রাত্রি আমি যাইরে, আগে পাগল সামলাই।

সাকীবের শপিং ব্যাগ সব আহমেদের হাতে। সে কি করবে বুঝতে পারছেনা। সে বোকার মতো, রাধিকা আর সাকীবের পেছনে পেছনে ছুটছে।

কিছুক্ষন পর অহমেদ ফিরে এলো খালি হাতে। সে রাত্রির সামনা সামনি চেয়ারে বসে, নিজের মাথার চুল টানতে টানতে বললো, আমার কপালটাই খারাপ।

রাত্রি বললো, কপাল খারাপ কেনো?

আহমেদ রাত্রির দিকে তাঁকিয়ে বললো, আরে! আপনি? আপনি না দুপুরে আমার সাথে খেয়েছিলেন?

রাত্রি রাগ করলো, তোমার সাথে আমি খেলাম কোথায়? তুমিই না আমার সাথে খেলে! আমার এতো মজার আলুর চপ, দুটোই তুমি খেয়ে ফেললে, মনে নেই তোমার?

আহমেদ হাসলো, বললো, ওই একই কথা। কিন্তু, এখন কি হবে? বড় আশা করে এসেছিলাম, সাকীব স্যার খাওয়াবে বলে। কি হতে কি হয়ে গেলো?

রাত্রি বললো, ধুর, তুমি কিছু ভাববেনা, তুমি কাজের লোক, আজকে আমি খাওয়াবো তোমাকে। তুমি খেতে বসে যাও।

আহমেদ বললো, মানে? কাজের লোক মানে?

রাত্রি বললো, আরে তুমি জানোনা। আজকে তো আমাদের হাসপাতালের ডিনার পার্টি হচ্ছে। সব অকাজের লোকগুলো ওখানে গেছে। তুমি যাওনি, তার মানে তুমি কাজের লোক। আমিও যাইনি।

রাত্রি নিজের মনেই হাসছে।

আহমেদ উঠে দাঁড়ালো, বললো, অ, আমি তাহলে যাই।

রাাত্রি চেচিয়ে বললো, এই এই কই যাবে। খাবে না?

আহমেদ বললো, না, আমার পকেটে টাকা নেই। কবে বেতন পাবো কে জানে?

রাত্রি বললো, ধুর বোকা, বললাম তো খাবার বিল আমি দিবো। তা ছাড়া, রাধিকা সিস্টারের খাবারের অর্ডার অলরেডী হয়ে আছে। ঐটাই তুমি খেয়ে নাও।

আহমেদ খুব খুশী হয়ে গেলো। এই অপরিচিত শহরে, এমন একটা কঠিন জীবনে, এত সহজভাবে রাতের খাবারটা মিলে যাবে ভাবতে পারেনি সে। সে বললো, ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছো, খেয়েই যাই।

নব্য বাংলা প্রতীক হাসপাতালের নবাগত আর নবাগতাদের সৌজন্যে আয়োজিত ডিনার পার্টিতে সিস্টার লতিফাকে ঘিরে বসলো তার চামচা নার্সগুলো। খাবার খেতে খেতে তাহমিনা বললো, রাধিকা সিস্টারটা কি সাংঘতিক! কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই কি সুন্দর সুপারভাইজারী করছে, ভাবতেই অবাক লাগে! কি বলেন সিস্টার লতিফা?

সাজেদা বললো, তার মানে? যোগ্যতা ছাড়া সুপারভাইজার হলো কি করে তাহলে?

তাহমিনা বললো, বুঝনা? সার্জনের বউ বলে কথা!

রোকেয়া বললো, তুমিও তাই মনে করো নাকি তাহমিনা। আমারও তাই মনে হচ্ছিলো। কে আবার কি মনে করে তাই ভয়ে শুধু এতদিন বলিনি। না হলে এত কম বয়সে নার্স সুপারভাইজার হওয়া?

সাজেদা বললো, আমারও তাই মনে হয়। নইলে এত দেমাগ পায় কোথায় রাধিকা?

রাধিকাকে নিয়ে সমালোচনাটা বেশ জমে উঠছিলো। রাধিকার বদনামে লতিফা মনে মনে বেশ খুশীই হচ্ছিলো। অথচ সে মুখে বললো, থাক থাক, মানুষের অগোচরে বদনাম করা ঠিক না।

সে একটু থেমে বললো, তোমরা কি কেউ ডেজার্ট খাবে নাকি? তোমরা যে যা খুশী খেতে পারো। আজকে ডেজার্টের বিলটা আমিই দিবো। আমি আবার রাধিকার মতো অতো কৃপণ না।

তাহমিনা লাফিয়ে উঠে বললো, সিস্টার, আমি মিষ্টি দই খাবো, অনেকদিন খাইনা।

সাজেদা বললো, আমার আইসক্রীম হলেই চলবে।

রোকেয়া তখনো ভাবছে। লতিফা বললো, কি রোকেয়া? তোমার কিছু চাই না?

রোকেয়া বললো, আমিও আইসক্রীম।

লতিফা বললো, আমার আবার সাদা মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সাদা মিষ্টি না খেলে কি, মুখ থেকে মিষ্টি কথা বেড়োয় নাকি? কি বলো তাহমিনা?

তাহমিনা বলে উঠলো, ঠিক বলেছেন সিস্টার। আমার তো মনে হয় রাধিকা সিস্টার কখনো মিষ্টি টিষ্টি খায়না। তাই সবসময় খিটখিটে মেজাজ তার।

তাহমিনা একটু থেমে বললো, আজকে একটা কবিতা আবৃত্তি করেন না সিস্টার!

সে সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা কি জানো? সিস্টারের কবিতার গলা খুবই ভালো!

লতিফা বুকটা ভরে উঠলো তাহমিনার কথায়। সে তার গর্বে ভরা মনটা লুকিয়ে লাজুকভাবে বললো, ধুর, এখানে কি কবিতা আবৃত্তি করার জায়গা নাকি?

লতিফার চেহারা দেখে মনে হলো, কবিতা আবৃত্তি করার জন্যে সে এক পায়ে খাড়া। সবাই একসংগে বলে উঠলো, সিস্টার! এটাই তো উত্তম জায়গা। প্লীজ! প্লীজ!

লতিফা আনন্দে গদগদ হয়ে গেলো। সে আবৃত্তি করতে শুরু করলো, কষ্ট আমার আজন্ম পাপ!

লতিফার আবৃত্তি শুনে সবাই কেমন যেনো বিরক্তিবোধ করছে। আসলে কবিতা আবৃত্তি করার মতো কোন গলাই নেই লতিফার। তাহমিনা আসলে লতিফাকে নিয়ে মজা করতে চেয়েছিলো। সে মোটেও বুঝতে পারেনি যে, এই বেসুরে গলায় লতিফা এই ডিনার পার্টিতে আবৃত্তি করতে শুরু করবে।

রাত্রির কল্যানে পেট ভর্তি খেতে পেরে আহমেদের আনন্দের সীমা রইলনা। সে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়েই রাত্রিকে বললো, আহ, পেট শান্তি দুনিয়া শান্তি, এখন বুঝি হাসপাতালে ফিরে গিয়ে, একটু ভালোমতো কাজ করতে পারবো।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, হাঁ, এখন থেকে আবার কাজে যাবে নাকি তুমি? ডাঃ সাকীবের কি মায়াদয়া নাই বুঝি মোটেও। তোমাকে কাজ দিয়ে নিজে ভেগেছে, তাই না?

আহমেদ বললো, আরে না না। সাকীব স্যার খুবই ভালো। সমস্যা হলো ঐ আশেক স্যার!

রাত্রি বললো, হাঁ হাঁ, জানি জানি, ঐ নতুনখালী সদর হাসপাতাল থেকে এসেছে যে, ঐ ডাক্তারটা না? ওর কথা আর বলোনা। সাংঘতিক পাজী লোক! পাত্তা দিবানা মোটেও।

আহমেদ মন খারাপ করে বললো, ইন্টার্নী যখন উপায় নাই, কিছু করার নেই।

আহমেদ নিজেকে হাসিখুশী করার চেষ্টা করলো। সে বললো, এবার বলো তোমার কথা।

একটু থেমে, সে হাসতে হাসতে বললো, সাকীব স্যার বললো, তুমি নাকি নবাগতা এক নার্সের তদারকী করছো? আমার তো তোমার উপর খুব হিংসে হচ্ছে।

কথাটি শুনে রাত্রির আনন্দের আর সীমা রইলনা। সে লজ্জা ভরা একটা চেহারা, আর সরলতায় ভরা হাসি নিয়ে বললো, এই আর কি ব্যাপার!

আহমেদ বললো, কি বলো রাত্রি, এইটা একটা বিরাট ব্যাপার। জুনিয়রদের তদারকী করা, আর বাচ্চা লালন পালন করাতো একই ব্যাপার। অনেকটা কষ্টের, আবার অনেকটা আনন্দের। সবমিলিয়ে জীবনের সার্থকতা।

আহমেদ কেমন যেনো অন্যমনস্ক হয়ে গেলো, আপনমনেই বিড়বিড় করে বললো, আহা, কবে যে লালন পালন করবো?

আহমেদের এই কঠিন কথা রাত্রি মোটেও বুঝতে পারলোনা। সে অনেকটা অবাক হয়ে, আর চোখে এক রকম বিস্ময় নিয়ে রেগে উঠলো হঠাৎই, বললো, হুম! এই ছেলে তুমি কি বললে? আমি কি মা? আমি বাচ্চা লালন পালন করি নাকি? আমাকে বিয়ে করার ফন্দি না?

রাত্রিকে হঠাৎ রেগে যেতে দেখে বিব্রত হয়ে পরলো আহমেদ। আপাততঃ বাঁচার জন্যে সে বললো, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন আসি রাত্রি, হাসপাতালে গিয়ে আবার আজকের সারাদিনের রিপোর্ট লিখতে হবে।

রাত্রির অনুমতির অপেক্ষা না করেই, আহমেদ অনেকটা ছুটে পালালো রাত্রির কাছ থেকে। দূর থেকে হাত নেড়ে বললো, আজকে রাতের খাবারের জন্যে ধন্যবাদ।

রাত্রি, আহমেদের এভাবে চলে যাবার ব্যাপারটা, কিছুই বুঝতে পারলোনা। সে কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনে ভাবতে লাগলো, ছেলেটা পাগল নাকি? যাক বাবা, পাগল পাগলের পথে গেছে, বাঁচা গেলো।

তারপর বাসায় ফেরার জন্যে সি এন জি খুঁজতে লাগলো।

চলবে